ছোটগল্প

দুষ্কৃতী

চয়ন মোদক

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালো করে দেখছিল স্নিগ্ধা। গত দু'দিন ধরে চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপে বছর তেইশের স্নিগ্ধাকে আজ অনেকটাই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। তার মা সুপর্ণা এসে তাড়া না দিলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ সে বিছানাতেই শুয়ে থাকত। কাঁদত কিছুক্ষণ। সুপর্ণার ঘরে ঢোকার শব্দ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিয়েছিল সে। কিন্তু একজন মা তার মেয়ের মানসিক যন্ত্রণা বুঝবে না তাও আবার হয় কখনও। মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল – ওঠ এখন। রাজেশ এল বলে। তোর পিসিরাও এসে পড়বে এক্ষুণি। মার স্নেহের পরশ পেয়ে বিছানায় শুয়েই মাকে জড়িয়ে ধরেছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল একফোঁটা, মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে সুপর্ণা বলেছিল – এ সব কিছু একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যা। সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস। নে ওঠ – বলে জোর করে মেয়েকে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অলস হাতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার মা-র কথাই ভাবছিল স্নিগ্ধা। ছোট থেকেই তার মাকে দেখে আসছে সে। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করেও নির্লিপ্ত থাকতে পারে তার মা।

স্নিগ্ধার বাবারা তিন ভাই বোন। পিসিরা বাবার বড়। পেশায় স্কুলমাস্টার তার বাবাকে স্নিগ্ধার কোনওকালেই একজন সম্পূর্ণ পুরুষ বলে মনে হয়নি। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর থেকে ঠাকুমা ও তার দুই পিসিই এ বাড়ির সব। পিসিদের কথার উপর একটি কথাও বলতে পারে না তার বাবা। ঠাকুমা এখন শয্যাশায়ী। পিসিদেরও সুখের সংসার। শুধু বড় পিসি নিঃসন্তান, এই যা। জন্মের পর থেকেই স্নিগ্ধা দেখে আসছে তার মা তার নিজের সংসারেই কেমন জানি দুয়োরানি হয়ে পড়ে আছে। সব ব্যাপারে পিসিদের মতামতই শেষ কথা। সুপর্ণা চেয়েছিল মেয়ের নাম রাখবে চারুলতা। কিন্তু পিসিরা বাধ সেধেছিল। বলেছিল, এমন গেঁয়ো নাম তখন কেউ রাখে নাকি। স্নিগ্ধার স্কুল, কলেজ এমনকি অনার্স নির্বাচনেও পিসিদের মতই প্রাধান্য পেয়েছে। স্নিগ্ধা বুঝতে পারে না, এটা পিসিদের অভিভাবকত্ব না খবরদারি।

রাজেশের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ের সম্বন্ধটা তার বড় পিসি এনেছে। রাজেশ তার বড় পিসেমশাইয়ের কলিগের ছেলে। রাজেশ এমবিএ। বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে চাকরি করে। সামনের বছর কোম্পানি ওকে বিদেশ পাঠাবে বলে ঠিক হয়ে আছে। স্নিগ্ধার মা মেয়েকে বিদেশ পাঠাতে রাজি না হলেও মুখ ফুটে কথাটি তাদের বলতে পারেনি। শুধু একবার স্নিগ্ধার বাবাকে বলেছিল, একটি মাত্র মেয়ে, বিদেশে থাকবে, দেশেই কোনও ভালো সম্বন্ধ দেখলে হত না। স্নিগ্ধার বাবা সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, এত ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করা যাবে না। মা-র এই অনিচ্ছা কী করে যেন ননদদের কানে পৌঁছেছিল। এ নিয়ে সুপর্ণাকে অনেক কটু কথাও শুনতে হয়েছে। স্নিগ্ধার ছোট পিসি তো মুখের উপরই বলেছিল, তোমার বংশে কি কেউ কখনও বিদেশ দেখেছে? থাকতে তো গণ্ডগ্রামে। সুপর্ণা কোনও উত্তর দেয়নি। চুপ করেছিল। স্নিগ্ধা জানে, তার মা-র মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতাটা আছে। শত অপমান সহ্য করেও চুপ করে থাকতে পারে। শত লাঞ্ছনা, শত কষ্ট ভুলে থাকতে পারে অনায়াসে। কিন্তু সেই মায়ের মেয়ে হয়েও স্নিগ্ধা কেন ভুলতে পারছে না সব কিছু। কেন বারবার মনে পড়ছে পরশু রাতের ঘটনা।

রাজেশকে প্রথমবার দেখেই পছন্দ হয়েছে স্নিগ্ধার। রাজেশ ফর্সা, লম্বা, টিকোলো নাক এককথায় ভদ্রস্থ বাঙালি চেহারা। গত একমাস ধরে তারা ফোনে কথাও বলেছে দু'জনে। আজ রাজেশ আসবে তার ব্লাড টেস্টের রিপোর্টগুলি নিয়ে। স্নিগ্ধার রিপোর্টগুলিও নিয়ে যাবে। রাজেশের বাবা চেয়েছিল দু'তরফেই যেন থ্যালাসেমিয়া ও এইচআইভি-র টেস্টটা করিয়ে নেওয়া হয়। সেদিন রাজেশই বলেছিল, আজ রিপোর্টটা দিতে এসে বিকেলের পর স্নিগ্ধাকে নিয়ে একটু বেরোবে। স্নিগ্ধার ইচ্ছে থাকলেও হ্যাঁ করেনি। ফোনের মধ্যেই অজুহাত দিয়েছিল বিভিন্ন কাজের। প্রতিটি মেয়ের মতো স্নিগ্ধাও জানে সবসময় নিজেকে সস্তা করে দিতে নেই। বড় পিসিই পরে স্নিগ্ধাকে ফোন করে বলেছিল রাজেশের সঙ্গে যেতে।

মুখে ক্রিম লাগাতে গিয়ে স্নিগ্ধা অনুভব করল কব্জির উপর ব্যাথাটা এখনও আছে। টিপে দেখল একবার। তখনই মনে পড়ল অর্পিতার কথা। পরশু রাতের পর আর তাকে ফোনই করা হয়নি। বিছানা থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে ফোন করতে যাবে এমন সময় বড় পিসি ঘরে ঢুকে বলে, কিরে তুই এখনও ড্রেস চেঞ্জ করিসনি। তাড়াতাড়ি কর। আর হ্যাঁ, রাজেশের দেওয়া শাড়িটাই পরে যাস। পিসির কথায় স্নিগ্ধা শুধু ঘাড় নেড়েছিল।

ব্লাউজটা পরে আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল স্নিগ্ধা। ঠিকঠাকই হয়েছে ব্লাউজটা। পরশু রাতে বাড়ি ফিরে আর ব্লাউজটা পরে দেখা হয়নি তার। দর্জির দোকানদারটা সেদিন অর্পিতা ও স্নিগ্ধাকে প্রায় একঘণ্টা বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে ব্লাউজটা বানিয়ে দিয়েছিল। এ নিয়ে সে অনেক কথাও শুনিয়েছে দোকানদারকে। আর দোকানদারটাও বারবার অপরাধীর মতো বলছিল, দিদি আর দশ মিনিট, এক্ষুণি হয়ে যাবে।

ক্লিনিক থেকে রিপোর্টগুলি নিয়ে যখন তারা দর্জির দোকানে গেল তখন রাত আটটা। দোকানে বসেই একবার রিপোর্টগুলি খুলে দেখেছিল স্নিগ্ধা। অর্পিতা ইয়ার্কি করে বলেছিল, কিরে, এইচআইভি পজিটিভ নাকি। অর্পিতার কথা শুনে দোকানদারটা একবার তাকিয়েছিল স্নিগ্ধার দিকে। স্নিগ্ধা সেটা লক্ষ করেছে। অর্পিতাকে হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে স্নিগ্ধা বলেছিল, হ্যাঁ পজেটিভ, তবে তুই খুশি হোস না। মনে করে দেখ, তোর জ্বরের সময় একবার রক্ত দিয়েছিলাম। বলেই দু'জন হাসল।

– হ্যাঁ বাবা বোসো। স্নিগ্ধা রেডি হচ্ছে। বড় পিসির গলার আওয়াজ কানে আসে স্নিগ্ধার। বুঝল, রাজেশ এসে গিয়েছে। বড় পিসি স্নিগ্ধাকে বারবার করে বলে দিয়েছে রাজেশের সামনে এরকম মনমরা হয়ে না থাকতে। এমনভাবে মিশতে যেন কিচ্ছুটি

পরশু রাতে বাড়ি ফিরে আর ব্লাউজটা পরে দেখা হয়নি তার। দর্জির দোকানদারটা সেদিন অর্পিতা ও স্নিগ্ধাকে প্রায় একঘণ্টা বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে ব্লাউজটা বানিয়ে দিয়েছিল। এ নিয়ে সে অনেক কথাও শুনিয়েছে দোকানদারকে। আর দোকানদারটাও বারবার অপরাধীর মতো বলছিল, দিদি আর দশ মিনিট, এক্ষুণি হয়ে যাবে